লিখিত রাত্রি

সাম্য রাইয়ান

লিখিত রাত্রি

সা ম্য রা ই য়া ন

লিখিত রাত্রি | সাম্য রাইয়ান

বাঙ্ময় প্রকাশনা

স্বত্ব : লেখক

রচনা : জুন–জুলাই ২০১৫

পাণ্ডুলিপি প্রকাশ : জঙশন (ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

বাঙ্ময় ই-বুক প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬

প্রচ্ছদ : রাজীব দত্ত

অক্ষরবিন্যাস ও ই-বুক নির্মাণ : লেখক

প্রকাশক : রাশেদুন্নবী সবুজ, বাঙ্ময় প্রকাশনা, বাঙলাদেশ।

01783116260, sammoraian@gmail.com

মানুষের শহরে আমি মমি হয়ে বসে থাকি
এলিয়েন। প্রাচীন শহর থেকে বেরিয়ে আসে
অসংখ্য বরফের কফিন। একা কবি সকল
মৌন বরফের ভাষা ভেদ করে শ্যামল ভ্রমের
দিকে তুমুল আততায়ীর মতো হাঁটেন, সত্যশিশু!

excimer blog:

www.sammoraian.blogspot.com

ভুগোল ক্লাসের স্মৃতি ভুলে গেছি তমোগুনে, মধ্যরাতে
কিচ্ছু মনে পড়ছে না কোনোমতে, যেন স্মৃতিখণ্ড জমা নেই
কোথাও, নির্জনে ডাহুক ডাকে নাই বুঝি সারাংশসমেত
কী বলি সেটা আর কার কাছে বলো, সকলই সকল; তুচ্ছ আলো;
ও মরণ – রাত্রির ত্রাতা, অনাহুত বেদনার ভারে ন্যুব্জ জীবন।

দুই

থেমে থেমে আসা তুমুল বর্ষাদিনে হিজিবিজি
দিকচিহ্নহীন পাগলাহরিণের থামার ইচ্ছেটুকু
দেখি না কোথাও! এমন তীক্ষ্ণরাতে শুধু শুধু
তাকিয়ে বাঁচা, অসহায় প্রজাপতি ছাদের কোণে
রঙভরা ডানা দেখাতে চায় না সে-ও; অসহায়।

তিন

উন্নত মন্দিরের কাছে প্রার্থনা করেছি – এ রাত
পূর্ণদৈর্ঘ্য হোক; নীলাভ ভায়োলিন স্থায়ী হোক
আদরের করোটিতে। মৃত শরীরের স্মৃতিবাহী
সকল জাহাজ জেগে উঠুক মানুষমেশিনের
অযৌন শিরদাঁড়ায় টিক টিক শব্দঘন্টা হয়ে।

চার

ছাপোষা মধ্যরাতে পুরোনো প্রেমিকাকে মনে পড়া
দোষের কিছু নয়। যখন তা ছিলো বৃক্ষের নতুন
পাতাদের মতো। ওরা সুউচ্চ জিরাফের গ্রীবা থেকে
নেমে এলে যে উজ্জ্বল পাখিঘুম আমার দিকে
তাকিয়ে থাকে, ওর কোনও ভাবনারেখা নেই!

পাঁচ

ঐচ্ছিক প্রেমে খসে প’ড়ে শৈশবের সমূহ জিহ্বা
জীর্ণ ভিখিরি হয়ে আটকে গ্যাছে হলুদ ক্যানভাসে।
এরকম অন্ধকার সময়গুলোতে মানুষ কী করে!
নতুন প্রেমিকার কথা মনে ক’রে উচ্ছন্নে যায়
নাকি ডায়নোসরের ফসিল বুকে নিয়ে ঘুমায়?

ছয়

শেষমেশ দুর্বিনীত হতে হতে হতে হতে আমি
স্পর্শকাতর রাত্রির ঘ্রাণ আবিষ্কার করলাম।
যা ছিলো আসলে প্রকৃত; নিষিদ্ধ সুরের মধ্যে লীন।
পুরোনো সঙ্গীত থেকে যারা জন্ম নিয়েছিলো; তারা –
তাদের গন্ধ অনুভব করে শুধুই সুরেলা হৃদয়।

সাত

সোনালী বাতাস বইছে দ্যাখো শ্যামল অন্ধকারে
এমন নির্মল রাতে একসাথে সারিবদ্ধ মানুষগুলো
কেন চাইবে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে বলো!
কী ক’রে তারা এতো বিষ বহন করেছে পাত্রে
আর কি বাকি আছে কিছু, বেঁচে করবার মতো?

আট

চারদিকে রোজ ঘন হয়ে ফোটা অন্ধকার পেরিয়ে
আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। আর এর মাঝে যদি
এরকম হতো, বাড়িটাই আসতো আমার দিকে
তাহলে এর অধিক, ঝড়-বাদলের রাতও
কী সুসজ্জিত শোভন প্রেমে কাটিয়ে দেয়া যেত!

নয়

সাপের ঝাঁপির মতো যে ঘরটিতে আমি থাকি
তার পশ্চিমে একটা আকাশমুখী জানালা আছে।
ঘরের একমাত্র যাত্রী হিসেবে আমি প্রতিদিন
সেই জানালা দিয়ে জিরাফের মতো গলা বার করি।
আমাকে বাঁচতে হয় এতো এতো সুন্দরের মাঝে।

দশ

এমন হয় না কখনও, মাঝরাতে চিঠি আসে
প্রেমিক বরাবর; আমারও এমন হয় নাই।
সবাই ঘুমালে ঘুমের আড়ালে লেখা চিঠি পড়া যায়।
বাদবাকি অসময়ে রোজ স্নানঘরে ঢুকে, অথবা
দোকানে যেতে যেতে পথে শুধু চিন্তাই করা হয়।

এগার

আমার দৃশ্যজুড়ে শুধু পাগল হওয়ার ছবি।
এমন অস্থির লাগে জানো, কোথাও কেউ যেন
খুন হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে উড়ে যাচ্ছে রক্তগাছ
ডানাঅলা সবুজঘাস। স্নানঘরে শীতল জল
গড়িয়ে পড়ছে আপনাতেই। কী ভয়ংকর বলো!

বার

নাগরিক সমূহ চোখ শুধু নিজেকেই দ্যাখে
পরিপার্শ্ব আড়াল হয় একেকটা হর্ণের শব্দে।
পুরোটা থেকেও তারা চশমা ব্যবহার করে
তবু কিছুই দ্যাখে না হায় আত্মকেন্দ্র ছাড়া।
এভাবেই বাথটাবে শুয়ে ওরা মরে যাবে আমরণ।

তের

ছায়াকে পেছন ধরে আসতে নিষেধ ক’রে দিয়ে
নির্ভার প্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছি গিনিপিগ।
সচরাচর বাইরে আসি না দিনে, রাতটা ভালো
সূর্যের কাছে যাই না, দূরত্ব পুষি; বৃষ্টির সব
ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকি।

চৌদ্দ

সারা রাত্রি অহংকার পেতে বসে আছি মায়াময়
আর যদি না হয় দেখা – কোনোদিন পৃথিবীর
বিপনীবিতানে; যদি কথা না হয় আর, হৃদয়
নিঃশব্দে মরে যায় অথবা তুমুল গরমে কেঁদে ওঠে
তবুও পুরোনো চরিত্র ফিরবে না হিরনের কাছে!

পনের

এবার তবে জলের কীর্তন হোক, কেননা শুধু ওর
হৃদয়েই আমি দেখেছি অভাবিত শান্তির গাণ্ডীব।
ওদিকে সুদূর এক নারী মুগ্ধ ভাবে ফুটন্ত
জলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিয়মমতো, যেন
প্রচণ্ড তাপে খসে যাবে শরীরের জোৎস্নাখণ্ড।

ষোল

একাকী আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য রায় ভাবে
রঙধনু প্রজাপতি এক জীবন্ত এরোপ্লেন।
নিঃসঙ্গ অসুখের থেকে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলেও
প্রতিটি অন্ধকারে মশাদের উৎপাত হবে তবু
ওর দ্বারা কোনো ইতিহাস হবে না কোনোদিন।

সতের

যে পথে স্পিডব্রেকার নেই সেটাতো নিরামিষ পথ
এইতো হেঁটে এলাম, কোথাও বাধা নেই যেতে
মনেই হয় না কিছু; চাকা চলে গেলে পাশ ফিরে শুই;
ঘুমিয়ে থাকতে পারি আজন্ম, বিকেল থেকে রাত
কোথাও আটকে যাবার মতো স্পিডব্রেকার নেই!

আঠার

চূড়ান্ত প্রণয়ের আগে কোথাও চলো প্রস্তুতিপর্ব
সেরে নিই। যেভাবে ঝড়ের আগে জলের ওপরে
মানুষ মন্ত্রপাঠ করে। যেকোনো ভাষায় তখন
ভাবনারেখা এক হয়ে মিলে যায় দিগন্তের পরে:
আমরা তো কেউ কারো নয়; একাকী একাকার।

উনিশ

এই যে প্রতিদিন কতোবার দিনেদুপুরে খুন
হয়ে যাচ্ছি; কেউ টের পাচ্ছে না, কিছু বলছে না।
এই যে ঘুমের মধ্যে ওঙ্কারধ্বণি শুনতে পাচ্ছি
এর মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে নেই জানেন! বরং
যে বাজার আমাকে নির্মাণ করে, ওটা মিথ্যায় ভরা।

কুড়ি

ওরা চায় আমি পাগল হয়ে যাই, একা হয়ে যাই
শহরে ঘুরিফিরি নিঃসঙ্গ মানুষ; আমার মৃত্যু হোক
জলের অভাবে নির্মম: বর্ণনাতীত। অথচ কতো
পাখি ফুল নদী বন্ধু হচ্ছে অকপটে; কী তুমুল
আড্ডা দিচ্ছি আমরা। সুযোগ নেই, হবো: একলা–পাগল।

একুশ

শূন্য গুহা থেকে এক অসমাপ্ত ছবির দিকে যেতে
প্রার্থনার অধিক পতনের খোঁজে হারালাম শূন্যে।
নিছক গহ্বর নয়, অন্তহীন যাপনের শেষে
অনুগত সময়কে ঘড়ি থেকে মুক্ত করে দাও
ইথারে জমা হোক ছেড়া ছেড়া ক্ষোভ; সূর্যমুখি খামে।

বাইশ

আঁধারি শরীরের দিকে ভালোবাসা তাক করে আছি।
রক্তাক্ত বিষণ্নতাকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছি
এ ঘরে শুধুই আমি আর মধ্যরাত; ঝিকিমিকি
সন্ধ্যাতারার মতো অন্ধকার। এতোগুলো জীবন
পেরিয়ে এখন আমার ঘুম পাচ্ছে; খুব স্বপ্ন পাচ্ছে।

তেইশ

মাথাব্যথাহীন সময়গুলো খুব উপভোগ্য মনে হয়।
কেন তবে এমন হলো সবকিছু; এইই ভেবে
তীব্র ফল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য পেয়ে
আমার আত্মর জন্য সারি সারি জীবনদর্শন
সেল্ফে রেখে দেখলাম, অন্ধকারে ওরা আলো দেয়!

চব্বিশ

কবিতার বাইরে যার কোনও জীবনই নাই;
অর্থলিপি নির্মাণ করে সময়ের পাটাতনে
উষ্ণ হলে জীবনবোধের পরিমাপ; কবিতা
লিখতে গিয়ে সে-তো নিজেই কবিতা হয়ে গেল!
জীবন, তুমি তো তার আঙুলের সমানও নও।

পঁচিশ

এই মাঝরাতে ক্যান তুমি দূরের পাখি হইলা
কও? উপকথাবাহী জল কিছু গড়িয়ে পড়ছে
কৈশরবেয়ে। রাতগাছের প্রতি কোনো আবদার
জমা রাখি নাই। দিনশেষে কলমও ক্লান্ত হয়
হাসির শব্দে আর ঢাকা পড়ে না কিছু; শব্দ হয়।

ছাব্বিশ

উফ্ কী গাঢ় বিভক্ত রাত, কী নির্লজ্জ দলাদলি
ঝিমধরা শেষে শূন্য বোতলের ভৈরব, গলাগলি!
সর্বত্র এতো বিষ – বিষময়, পুনরায় ধুয়েমুছে
সাফসুতোর করতে হবে আমাকেই; কখনোই
শান্তি হবে না কোথাও, প্রেমে, অপ্রেমে; জানা কথা।

সাতাশ

কতো আকৃষ্ট হয়েছিলাম, ছবিতে দেখে তাকে
মৃদু ভালোবাসা ধীরে ধীরে তপ্ত ও গতিময় হলে
ছুটে গেলাম, ছুঁয়ে দেখলাম গায়ে হেলান দিয়ে।
স্মৃতিতে এখনো সবটা মনে আছে; অথচ সেদিন
দোয়েল বলেছিলো, বৃক্ষ আমাকে মনে রাখে নাই!

আঠাশ

রাত্রি থেকেই সকল রহস্য জন্ম নেয়। প্রান্তরে
শীতল চাঁদকে খুঁজে, না পেলে অভ্যন্তরে ভয় বাড়ে
দৃষ্টিসীমায় ফোটে শাদা শাদা ফুল; আলো ফুটবার
আগেই তারা ঘুমাতে যায়; দু-একটা অন্ধকার
শুধু প্রকৃত জেগে থাকে। এই শুধু, শুধু এই।

ঊনত্রিশ

কৈশোরসেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে এলাম শহরে।
কী আছে নদীর গভীরে? আস্ত মাতাল সাগর?
অথবা শামীম সৈকতের বাঁশি? কিছু নাই। –ছাই।
বৃথা নদীজন্ম, কৈশোরসেতু, সোডিয়াম আলো;
আমাদের কথা কেউ ভেবেছে, যারা ঘুমিয়েছে?

ত্রিশ

জ্ঞানমুখি বৃক্ষকে শোনো, ওর কাছে যাও, ওকে
আলিঙ্গন করো প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়। বিভিন্ন আকাশে
তার একই রূপ; একই রকম যথার্থ ডানা।
কেন সে হলো মিলনকাতর, প্রবল বিপদেও
এতো নিরুত্তাপ কেনো, তাকে জিজ্ঞেস করো, ভালোবাসো।

একত্রিশ

ভাবছি ডানাঅলা জিরাফের কথা, তার সাথে সাঁতরে চলা প্রজাপতি। তখন ওর নাম জলপতি ছিলো কি না তাই ভাবছি। দেখছি ডানাঅলা এক বৃদ্ধ জিরাফ মাথার আকাশে সুর তুলে উড়ছে। তাকে গ্রহণ করেছে কি মেঘমল্লার? ভাবো তো।

বত্রিশ

নবীন বৃষ্টি জমিয়েছে প্রবীন বাগানের ডেরা।
কদম থোকার মতো সুদৃশ্য শান্তি, মদের অধিক
এক স্বর শোনা যায় থেকে কাছাকাছি – কিছুটা দূরে।
আড়াল হয় না কিছু, পাশের অন্ধকারে। তবু
বাগানের দিকে যেতে থাকি পুরোনো কৌতূহলে।

তেত্রিশ

রাত আড়াইটা বাজলেই মগজভর্তি আস্ত
জুরাসিক পার্কজুড়ে হাঁটাচলার শব্দ শোনা যায়।
পুরো পৃথিবীটাই আসলে পার্কবেঞ্চির তলা;
ফাটা বাদামের খোসা আর চিপসের প্যাকেটে ভর্তি।
সেখানে আমরা একেকটা প্যাকেটে মোড়ানো বিস্কুট।

চৌত্রিশ

অপেক্ষা করি – করতে হয়; হাতমুখ ধুয়ে বসি –
বসতে হয়; কাগজে প্রস্তুতি নিই – প্রস্তুত হতে
হয়; শব্দকে চলন্ত ট্রেন থেকে নামাতে হয়
কতো বিচিত্র কৌশলে। অথচ সকলে জানেন
এই শহরে রাতের কোনো ট্রেন নাই – ছিলো না।

পঁয়ত্রিশ

খোঁপায় ফুটেছে ফুল, কানের লতিতেও; এতোটা
যত্নে বপন করেছ বলে বাতাসে ছড়িয়ে আছে
ফুলেল ঘ্রাণ। কোনোদিন তারা জল ও স্রোতের
মাঝে তফাৎ করেনি ব'লে প্রকাশ্য বিজয়ীর মতো
কী বেজায় শব্দ করছে বাতাসে – সুঘ্রাণ সুঘ্রাণ।

ছত্রিশ

কয়েকটা মন খারাপের রাতে কেন জানি না আমার বনমোরগ হতে ইচ্ছে করে। আকাশই ইচ্ছেকে ডানপাশে সরিয়ে রেখে ভোরবেলা সফেদ কাগজে চিড় ধরানো বিদারক চিৎকার হতে ইচ্ছে করে। শুনেছি, বনমোরগের কোনো আত্মীয়-স্বজন নাই!

সাইত্রিশ

রাতের দিগন্তজুড়ে শুধু একটা গাছ : অন্ধকার
আপেক্ষিক নীল ঝুলে আছে তার প্রতিটি ডগায়।
বিষণ্ন বরফের ঋণে শ্রান্ত হয়েছে মাটিবতী
তীব্র কামনাবাগান। এমন সময়ে যোনিফুল পক্ক
হয় বলে রাত্রি একটা অনাহুত বেদনার নাম।

আটত্রিশ

আলোটা সরাও; রাতের মুখোশ সরিয়ে আমি
ওর মুখটা দেখতে চাই। রূপালী আভার গভীরে
ফুটন্ত লালের চুল্লীমতো গুহা কতোটা আলোহীন
কতোটা রূপসী অন্ধকার সেইসব জেনেবুঝে
ফিরে আসবার মতো স্রেফ কয়েক জীবন সময় চাই।

ঊনচল্লিশ

প্রশান্তির সন্ন্যাসে আমি নাই। যেভাবে ছুটতে থাকে
পাগলাঘোড়াবেশী দ্রুতগামী সিলিংফ্যানের ডানা;
ওদের ঘোরাফেরা দেখে আমার অস্থির লাগে।
অতিরিক্ত শোকে মূহ্যমান তরুণীকে বাহুতে আবদ্ধ
করে দেখাতে পারি বিরহসঙ্গীতেও আমি নাই।

চল্লিশ

দেয়ালভর্তি ঝরণাধারা আর ওরিয়ানার
ব্যাগে সহস্র ইঙ্গিতের খেলনামমি ছড়িয়ে
দিনান্তে গর্জন থেমে গেছে, নিয়ত যেমন হয়
মগজের ভিতরে গড়া সুনশান হলুদবর্ণ
শহরতলী; বলোতো কেন তুমি শব্দহত্যাকারী?

একচল্লিশ

এসো হাইহিল, মৃদু জুতার বাগান, অহেতুক
মেতে উঠেছি ধনুকের সুতোয়; সামান্য ছুতোয়।
আকাশের পথে হেঁটে যেতে যেতে জল কাদা সব
একাকার পথে অনেক কিছুর সাথে হারালাম
জুতো। ফিতে বাঁধাটা শেখা হলো না জীবনজুতোর।

বিয়াল্লিশ

শূন্যবলের ভেতর দিয়ে শুনতে পাচ্ছি মোহভঙ্গের
গান; ব্যাকরণে তা শীতার্তের কুয়াশাসংগীত।
ছত্রভঙ্গ হবার আগে জেনেছি, রঙকরা পাখিদের
ঠোঁট থেকে ভেসে এলে সুরেলা সংগীত; সুসজ্জিত
পুস্তক, মানুষের মনে কোনো প্রভাব পড়ে না।

তেতাল্লিশ

রহস্যের উৎসমূল থাকে রাতের গভীরে
প্রোথিত। যতো নিষিদ্ধ স্তবক পাঠ করেছে তারা
দু'জনে; অপরকে আশ্রয় করেছে গোপনে। এতো
যে অকারণে হাসি, আমি কি জানি, কাকে বলে প্রেম?
অথবা শিখেছি কখনো জীবনের প্রকৃত বানান?

চুয়াল্লিশ

মানুষের শহরে আমি মমি হয়ে বসে থাকি
এলিয়েন। প্রাচীন শহর থেকে বেরিয়ে আসে
অসংখ্য বরফের কফিন। একা কবি সকল
মৌন বরফের ভাষা ভেদ করে শ্যামল ভ্রমের
দিকে তুমুল আততায়ীর মতো হাঁটেন, সত্যশিশু!

পঁয়তাল্লিশ

পেছনে একটা লাথি আমি দিতেই পারি কষে
আজকাল কে খোঁজ নেবে, আর করবে প্রতিবাদ?
কমোডের পাশে বসিয়ে মুখে বিসর্জনও দিতে
পারি অকপটে। কেউ কি এসবের খোঁজ নেবে
কোনোদিন; যদি একটা খুনও করে ফেলি আজ!

ছেচল্লিশ

কিছুটা আঁধারে রূপালী গাছ প্রাচীন উটপাখি
হয়ে ঝুলে আছে মেঘের কলোনীতে। আমি দেখলাম
তাকে, হৃদয়ের চশমা খুলে। আমার খুব মন
চায় ওই পাখিটার পিঠে উঠি। সাদরে সে গ্রহণ
করুক আমাকে; আমার সকল বৃথালাপায়োজন।

সাতচল্লিশ

ঘর গোছানো সেরে মাছপরীদের সাথে হাঁটতে
বেরিয়ে মনভালো অনুভূতি হলে নিজেকে আমার
আনন্দ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র মনে হয়।
মনে হয় গভীর থেকে বেরিয়ে আসে বুঝি অজস্র
শিশুদের স্বতস্ফুর্ত কুলধ্বনি; সদ্য প্রকাশিত।

আটচল্লিশ

বাদ রেখে জারিজুড়ি সব, জ্বলে ওঠো সামান্য
আগুন। স্বদেশী আয়োজনে সিক্ত প্রণয়ের রাতে
পরিপূর্ণ বেঁচেথাকাজুড়ে আমি কারো অক্ষমতা
স্বীকার করি না। জ্যান্ত গানচিল ভেসে যাবে এমন
কিছু কথা আমাকে বলতেই হবে শূন্য আক্রোশে।

ঊনপঞ্চাশ

যেতে যেতে পথে, মধ্যরাতে; কুকুর, পুলিশ ও
বেশ্যাকে নিঃশব্দে বলি: পথ আটকানো নিষেধ। এ
রাত শুধুই প্রেমিক, কবি ও পাগলের। গান শেষে
দ্যাখো পুরোটা জুড়ে শুধু ছেড়া পাতাফুল পড়ে
ছিলো যা, সকল খারিজ হলো অন্ধবাগান থেকে।

পঞ্চাশ

বিবাহিত ভোর থেকে খসে গ্যাছে জ্বলজ্যান্ত সকল
আড়াল। নাক ডোবালে তোমার মধ্যবিন্দুতে – যা কিছু
পেতে চাই গভীর কূপ থেকে, তার সবটাই
জীবন্ত জল হয়ে আসে প্রকৃত প্রস্তাবে। তারপর
জামাজুড়ে শুধু মধু ও মহুয়ার ঘ্রাণ; বয়ে যায়..

একান্ন

ভুল স্পেসে সঠিক বাক্যফুলটি ফুটতে দ্যাখেনি
কেউ; রঙের বাগান থেকে সবুজহাতির ডানা
ঝাপটাতেও দেখেছে কি? চেরীফুলের গভীরে
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আকাশবাণীতে গোপন
খবর: গৃহগামী পাখিরা গাইছে আড়ষ্টগীতি!

বায়ান্ন

প্রকৃত প্রশ্নচিহ্নের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে সমূহ
উত্তরমালা; বোকাপাখি তাকে হারায় বারবার
উৎসবিন্দুচ্যুত হয় প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে। উফ্!
ঘুমফেলে ও দ্যাখো, আমার দিকে তাকিয়ে আছে; ওর
কোনও লালজামা নেই! কোনও দুঃখঋতু নেই।

তেপ্পান্ন

বাবার কান থেকে খসে যাচ্ছে গ্রামোফোনের সুর..
পৃথিবীর সব পথ আজ ফাঁকা পড়ে আছে; কোথাও
কোনো গান নেই। সারিবদ্ধ চিত্রকল্প হেঁটে হেঁটে
ওভারব্রীজ পার হলে, চূড়া থেকে অবিরত নেমে
আসা হাসিভর্তি চুম্বনধ্বনি, আমাকে স্পর্শ ক'রো।

চুয়ান্ন

খুন হয়ে গেছি শ্রাবণবরষায়। যদি জাগতে
হয় আমাকে ঘুমের ভেতরে ফের, তাহলে ফিরতি
পথে তোমাকেই ডেকে নেবো। নিগূঢ় বৃষ্টিভোরে
তোমার ঘনত্ব বাড়াও মেঘ, আমাকে আড়াল করো।
নিত্য ব্যাবহার্য আনন্দ থেকে আমাকে মুক্ত করো।

পঞ্চান্ন

ঘুমের ভেতরে ছিলো জবুথবু ক্রোধ। নিশাচর
এগিয়ে গেলে নৃত্যরত রাত্রির দিকে, ডানার
আড়ালে লাফিয়ে পড়ে জীর্ণ হেলিকপ্টার। কোথায়
লুকায়ে রাখি বিষাদগ্রস্ত ভ্রম, প্রাক-রাত্রির
বেদনাসকল; কোথায় লুকাই বলো তোমার শুভ্র শঙ্খ?

sammoraian.blogspot.com